প্রকাশক

মুহাম্মদ সারওয়ার হোসাইন (আজীজ)
বাড়ী নং-১ডি, সেক্টর-৩, রোড-২, উত্তরা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৯৩৪১১

সত্ব

সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল ১৪১৮ হিজরী

প্রচ্ছদ

এট্যাচ এ্যাড
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কম্পিউটার কম্পোজ

শারমিন কম্পিউটার্স এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বিনিময়

দশ টাকা মাত্র নয় আট বার

AL-FIQUHUL AKBER
BY : IMAM-E AZAM ABU HANIF (R)
TRANSLATED BY : ABU SAYED MOHAMMED YOUSUF ZILANY
PUBLISHED BY : MOHAMMED SAROWARE HOSAIN (AZIZ)

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

তাঁর প্রকৃত নাম নু'মান। ডাক নাম আবু হানিফা। ইমাম আযম বা মহান ইমাম তাঁর সম্মাজনক উপাধি।

তাঁর পিতার নাম সাবিত আর পিতামহের নাম ছিল জওতী। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। কারো মতে, তাঁর পিতামহ সর্বসাধারণ্যে যাওতী নামে পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মারযেবান ও মাহ্। আবার কারো মতে, এগুলো তাঁর উপাধি। ইসলামী আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা ছড়িয়ে যায় তাই তিনি পারস্য থেকে হিযরত করে ইসলামী রাষ্ট্র কুফায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (খ্রীঃ) ৮০ সনে কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন স্বচ্ছরিত্রবান, ভদ্র, নম্র, চতুর, ধীরস্থির এবং মিষ্টভাষী। তাই প্রতিবেশী সকলেই তাঁকে ভীষণ আদর, স্নেহ করতেন এবং নিজ সন্তানের ন্যায় ভাল বাসতেন।

বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতার জন্য তিনি বাল্যকালে লেখা-পড়া করার সুযোগ পাননি। যৌবণে এসেই তিনি লেখা-পড়ার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। তাঁর স্মরণশক্তি এবং প্রতিভাও ছিল আশ্চর্য। এ প্রতিভার গুণেই তিনি হয়েছিলেন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম।

তিনি স্বল্প পরিসরেই হাদীস, তাফসীর, আদব, ফেকাহ, আনসাব, ক্যলাম ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদের সংখ্যাই ছিল এক হাজারের অধিক। তন্মধ্যে ইমাম শায়াবীর অবদান ছিলো তার লেখা পড়ার ব্যাপারে খুবই বেশী।

সাহবাদের মধ্যে তিনি দু'শতাধিক বুজর্গ সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেন। যাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, ওসামা ইবনে যায়দ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আরকাম, আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব, রাফে, আবু দারদা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সহ অনেক সাহাবীর সহচর্য লাভ করেন। তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করে ইজতিহাদের মর্যাদা লাভ করেন।

তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, 'আমি আল্লাহ পাকের এমন দুশত প্রিয় বান্দার সহচর্য ও সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যাঁরা রাসুলে খোদা (দঃ) –এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন।'

ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি সর্বজনবিধিত। সমকালীন যুগে তাঁর ন্যায় যেমন কোন ফক্বীহ ছিলেন না, তেমনি পরবর্তীতে এমন ফক্বীহ জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনিই এককভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর

ওস্তাদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত ইমাম হাম্মাদ (রঃ)। ইমাম হাম্মাদকে তিনি খুব বেশী শ্রদ্ধা করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হলো- "যতদিন আমার ওস্তাদ ইমাম হাম্মাদ জীবিত ছিলেন, ততদিন আমি তাঁর বাড়ীর দিকে পা মেলিয়েও উপবেশন করিনি।"

বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রবর্তিত মাযহাবই শ্রেষ্ঠ। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ট এ মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, এ মাযহাবের নিয়মকানুন সরল, সহজ এবং তথ্যনির্ভর। কুরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়ামের আলোকেই এ মাযহাব প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) -এর অনেক ছাত্র ছিলেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে তাঁর শিষ্য ছিল না। তার শিষ্যদের সংখ্যা গননা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে বিশেষ কয়েকটি স্থানের নাম বলা যায়। যেগুলোতে তাঁর শিষ্য ছিল অসংখ্য। যেমন- মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, বসরা, ওয়াসতা, মোসেল, জায়ীরায়ে রোকাহ, নাসীবাইল, রমলা, মিশর, ইয়ামন, হাল্‌ওয়ান, ইয়ামামাহ, বাহরাইন, বাগদাদ, নাহওয়াজ কেরমান, ইস্পাহান, আস্তরাবাদ, হামদান, নাহারাওয়ান্দ, কাওমাছ, দামগান, তাবরিস্তান, জুরজান, নিশাপুর, সারখাস, নসা, বোখরা, সমরকান্দ, কাম, সনআন, তারমিয়, হারাত, নাহস্তার, ইনযাম, খাওয়ায়জিম, মাদায়েন, মুসাইসাহ, হামাস ইত্যাদি। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যে মহান কীর্তির জন্য মুসলিম জাহানে আমর হয়ে আছেন, তা হলো তাঁর ফিকাহ সংগ্রহ। তার পূর্বে ফিকাহ বা বিধান শাস্ত্রের কোন বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। এ কারণে ধর্ম বিষয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হতো। এ অভাব দূরকরণের জন্য তিনি চারসহস্র বিশেষ বিচক্ষণ ও মহাপন্ডিত ছাত্রদের সহযোগিতায় পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটি মহামূল্যবান তথ্য আবিস্কার করেন। এটাই বিশ্ববিখ্যাত **"ফিকহে আকবর"** নামে পরিচিত। (যা সদ্য প্রকাশিত হয়েছে) তাঁর এ বিশেষ কর্মের জন্য তিনি মুসলিম জাহানে ইমাম আযম নামে খ্যাত। এ গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও ফিকাহ এবং কালাম শাস্ত্রের মূল উপাদান এটাই। এ ছাড়াও তাঁর আরো দুস্বটি মূল্যবান পুস্তক হলো, মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা, আল-আলিমু ওআল মুতাআল্লিম।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)- এর সন্তান-সন্ততিদের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় নি। তবে এটুকুই জানা যায় যে, হাম্মাদ নামক তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিলেন। যিনিও পিতার ন্যায় বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং একজন উঁচু দরের আলিম ছিলেন। ১৪৬ হিজরীর শেষভাবে ৬৬ বছর বয়সে এ মহান ইমাম বাগদাদের কারাগারে তাঁর মাওলায়ে হাকীকীর সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হি রাজেউন।

অনুবাদকের কথা

সৈয়দুনা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বিশ্বব্যাপী একজন অতীব খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ইসলামের চতুমার্যহাবের তিনি একজন সম্মানিত ইমাম। বিশ্ব মুসলিমের অধিকাংশ তাঁরই মাযহাবভুক্ত। মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে প্রায়ই তাঁর শিষ্য। এ জন্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ) -এর ন্যায় শ্রদ্ধেয় ইমামও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'আমরা ইমাম আবু হানিফার পরিবারভুক্ত।' মুসলমানদের মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে চেনে না, এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। আলোচ্য পুস্তিকাটি তাঁরই রচিত। আয়তনে ছোট হলেও ইসলামের মৌলিক আকায়েদ এবং মাসয়ালাসমূহ এতে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সত্য কথা হলো, এটাই ফিকাহর সংক্ষিপ্ত সার। যা থেকে অন্যান্য ফিকাহ্ গ্রন্থগুলো বিশালভাবে লিখিত হয়েছে। এ মহান ইমামের পুস্তিকাটি অনুবাদ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শোকরিয়া এবং প্রিয় হাবীব, রাসুলে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে জানাই অসংখ্য সালাত-সালামের হাদিয়া। আমাদের এ দেশে মূল আরবী বইটি একেবারেই দুষ্পাপ্য। তাই সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠকদের সুবিধার্তে মূল আরবী ইবারতও সংযুক্ত করা হলো। এছাড়া **'ওসিয়তনামায়ে ইমাম আবু হানিফা'**, নামক একটি ওসিয়তও এতে সংযোজিত হলো, যা তিনি তাঁর সাথীবৃন্দ এবং বিশ্বমুসলিমদের উপলক্ষ্য করে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমাদের জীবনে এ ওসিয়তের গুরুত্ব খুবই অপরিহার্য। এ বইটি প্রকাশে যিনি আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন, বিশেষতঃ আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই জনাব মুহাম্মদ সারওয়ার হোসাইন (আজীজ) শত ব্যস্ততার মধ্যেও এটা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে চিরঋণী করে রেখেছেন। আল্লাহ পাক দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁকে মর্যাদার আসনে সম্মানীত করুন। তিনিসহ সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন আমীন। বেহুরমতে সাইয়েদুল মুরসালীন।

নিবেদক-

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم .

তাওহীদের ভিত্তি এবং যার উপর ইতিক্বাদের (বিশ্বাস) বিশুদ্ধতা অপরিহার্য, তা হলো, মুসলমানগণ এ বলে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যে, **"আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিস্তাদের উপর, তাঁর কিতাবসমুহের উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার উপর, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে (নির্ধারিত) ভাল-মন্দের উপর, হিসেব-নিকেশ, মীজান এবং জান্নাত-জাহান্নামের উপর।"** এসবগুলো অবশ্যই সত্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি (আল্লাহ) একজন হওয়া গণনার ভিত্তিতে নয়, বরং এ ভিত্তিতে যে, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

অর্থাৎঃ "হে নবীবর (দঃ)! আপনি বলুন, আল্লাহ এক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর না তাঁকে কেউ জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই (হওয়া অসম্ভব)।"

সৃষ্টি জগতে আল্লাহ তায়ালা কোন বস্তুর ন্যায় নয়, আর না তাঁর সৃষ্টিতে কোন বস্তু তাঁর ন্যায় হতে পারে। তিনি স্বীয় পবিত্রতম সত্ত্বা ও কর্মগত নাম এবং গুণাবলী সহকারে চিরকাল থেকে ছিলেন আর চিরকাল থাকবেন। তাঁর সত্ত্বাগত গুণাবলী হায়াত অর্থাৎ চিরকাল জীবিত থাকা, কুদ্‌রত অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান হওয়া, ইল্‌ম (সব কিছু জ্ঞাত হওয়া), তাঁর পবিত্রতম কালাম (বাণী), শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং ইরাদাহ্ (ইচ্ছা) এসব কিছু তাঁর জ্বাতী (সত্ত্বাগত) গুণাবলী।

তাঁর (সিফাতে ফে'লী) কর্মগত গুণাবলীর মধ্যে তাখলীক (সৃষ্টি করা), তারজীক্ব (সবাইকে জীবিকা প্রদান করা), ইন্‌শা, ইবদা', সন্‌য়া' ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। (ইন্‌শা, ইবদা' ও সন্‌য়া' শব্দত্রয়ের অর্থ হলো,মূল থেকেইএমন নতুন বস্তু আবিষ্কার করা ইতোপূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিলো না।) তাঁর আরো অনেক কর্মগত গুণাবলী রয়েছে।

তিনি চিরকাল থেকে স্বীয় পবিত্রতম নাম ও গুণাবলী সহকারে ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন। তাঁর কোন নাম ও সিফাত নব আবিষ্কৃত নয়। তিনি নিজ জ্ঞানে চিরকাল থেকেই জ্ঞানময়। জ্ঞান তাঁর চিরন্তন ও অনন্তকালীন গুণ।

আর তিনি নিজ শক্তিবলে শক্তিমান।তিনি স্বীয় কর্মসহকারে কর্তা। আর 'কর্ম' হলো তাঁর অনন্তকালীন ও চিরন্তন গুণ (আযলী সিফাত), 'কর্তা' হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই, আর ক্রিয়ার কর্ম (মাফ'উল) অর্থাৎ কর্তার সৃষ্টবস্তু হলো মাখলুক। আর আল্লাহ তায়ালার কর্ম মাখলুক (সৃষ্টি) নয়। তাঁর পবিত্রতম, মহান সিফাত না নব আবিষ্কৃত, আর না তা সৃষ্টি। সুতরাং যারা এ উক্তি করে যে, **"আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী মাখলুক অথবা ধ্বংসশীল কিংবা তাতে নিশ্চুপতা অবলম্বন করে অথবা সন্দেহ পোষণ করে তাহলে তারা নাস্তিক ও কাফির"।**

কুরআন করীম আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম। মাসহাফে লিখিত, বক্ষসমূহে সংরক্ষিত, যা মানুষের মুখে অসংখ্যবার পাঠ করা হয় এবং তা নবী করীম (দঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর **আমাদের ঐ শব্দাবলী যদ্বারা আমরা কুরআন আদায় করে থাকি তাহলো মাখলুক। আর আমাদের ঐ লিখা যদ্বারা আমরা কুরআনের (শব্দ) লিখি তাও মাখলুক। আর ঐ কুরআন করীম, যা আল্লাহর কালাম তা মাখলুক নয়।**

আর **কুরআন করীমে হযরত মুসা (আঃ) অথবা অন্যান্য আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম-এর যেসব ইতিহাস ও কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে এবং ফেরআউন ও মালউন ইবলিসের যে ঘটনাসমূহ ব্যক্ত হয়েছে, এ সকল বাণী আল্লাহ্ তায়ালার কালাম, যার সংবাদ আল্লাহ্ তায়ালা নিজ পক্ষ থেকে দিয়েছেন।** আল্লাহ্ তায়ালার কালামতো অবশ্যই মাখলুক নয়। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির কথা মাখলুক। কেননা, **কুরআন করীম আল্লাহ তায়ালার কালাম। সুতরাং তা ক্বাদীম (ধ্বংসহীন), আর না তা সৃষ্টির কথা (যা ধ্বংসশীল)।**

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালার কালাম শ্রবণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান- **وكلم الله موسى تكليما (ওয়াকাল্লামাল্লাহু মুসা তাকলীমা') অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা মুসার সাথে কথা বলেছেন।** নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কালামকারী ছিলেন, অথচ্ হযরত মুসা আলায়হিস সালাম তখনও কথা বলছিলেন না। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা চিরকাল থেকে সৃষ্টিকর্তা

ছিলেন। আর কোন বস্তু তাঁর ন্যায় নেই। তিনি সর্বদষ্টা ও সর্বশ্রোতা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে কালাম করেছেন, তখন তিনি তাঁকে ঐ কালাম দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন, যা তাঁর চিরকালীন গুণ ছিলো, আর এ অবস্থা তাঁর অন্যান্য সকল গুণাবলীরও, যা মাখলুকের গুণাবলীর বিপরীত যা হাদিস, ধ্বংসশীল ও মাখলুক।

আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানময় ও বিজ্ঞ। কিন্তু **তাঁর জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের ন্যায় নয়। তিনি শক্তি রাখেন, আমাদের শক্তির ন্যায় নয়। তিনি দেখেন, কিন্তু তা আমাদের দেখার ন্যায় নয়। তিনি শ্রবণ করেন কিন্তু তা আমাদের শ্রবণের ন্যায় নয়। তিনি বাক্যালাপ করেন, কিন্তু তা আমাদের কথা-বার্তার ন্যায় নয়।** কেননা, আমরা যন্ত্রপাতি তথা জ্ঞান, মুখ এবং অক্ষরসমূহ ইত্যাদি দ্বারা কথা বলে থাকি কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাজ-সরঞ্জাম ও অক্ষর দ্বারা কালাম (করা থেকে পবিত্র) করেন না। কেননা, সকল অক্ষর মাখলুক আর আল্লাহ তায়ালার বাণী মাখলুক নয়।

আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতম জাত হলো شئ 'শাঈ' (বস্তু), কিন্তু তা কোন মাখলুকের বস্তুর ন্যায় নয়। আর 'শাঈ' অর্থ হলো (ওজুদ) অস্তিত্ব। তার অস্তিত্বের জন্য না কোন শরীরের প্রয়োজন, আর না জাওহার (جوهر) ও আরজ (عرض), **না তাঁর কোন সীমা রয়েছে, না কোন প্রতিদ্বন্দ্বী। আর না তাঁর কোন শরীক ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে।**

আল্লাহ তায়ালার হাত, চেহারা ও আত্মা (নাফস) রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেছেন। সুতরাং **কুরআন করীমে আল্লাহ তায়ালা হাত, চেহারা ও আত্মার উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর আকৃতিবিহীন গুণাবলী। এটা ও বলা যাবেনা যে, হাত দ্বারা তাঁর কুদ্‌রত অথবা নি'মাতই উদ্দেশ্য।** এ কারণে যে, এমনি বলার দ্বারা সিফাত বাতিল হয়ে যায়। এটা কদরিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য। কিন্তু হাত তাঁর এমন একটি গুণ যার হাক্বীকৃত-মূলতত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে আমরা অনবহিত।

গযব ও সন্তুষ্টি আল্লাহ তায়ালার আকৃতিহীন দু'টি গুণাবলী। **আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টি করা কোন বস্তু থেকে নয়। আল্লাহ তায়ালা অনন্তকালে (আজল) সকল বস্তু সৃষ্টি করার পূর্বে এসব কিছু সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন।** তাঁর পবিত্রতম সত্ত্বা (আল্লাহ) সকল বস্তুতে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করে তাতে নিজ নির্দেশ জারী করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর ইচ্ছা জ্ঞান এবং তাঁর কথার তাক্বদীর এবং লাওহ-ই মাহফুজে লিখার বাইরে হবে। কিন্তু লাওহ-ই মাহফুজে তা লিপিবদ্ধ করা গুণ সহকারেই, হুকুম সহকারে নয়।

ভাগ্য, নিয়তি ও ইচ্ছা ইত্যাদি তাঁর আকৃতিবিহীন অনন্তকালীন ও স্থায়ী গুণাবলী। আর **আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্বহীন ও সৃষ্টিহীন বস্তুকে অস্তিত্বহীনাবস্থায় জানেন। তিনি তাও জানেন ঐ সৃষ্টিহীন বস্তু কিভাবে সৃষ্টি হবে যখন তিনি তা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি অস্তিত্বময় বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তা নিজ অস্তিত্ব সহকারে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লাভ করবে। আর জ্ঞাত আছেন তা কিভাবে ধ্বংস হবে।** (আল্লাহ তায়ালা দণ্ডায়মান ব্যক্তির) দণ্ডায়মানাবস্থার প্রত্যেক কর্ম দণ্ডায়মান অবস্থায় জানেন। অতঃপর যখন সে বসে, তখন তার অবস্থা বসা অবস্থায় জ্ঞাত হন। এটা ব্যতীত যে, তাঁর জ্ঞান পরিবর্তন হয় অথবা নতুন ধ্বংসশীল জ্ঞান তাঁর হাসিল হয়। কেননা, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, মতানৈক্য-মতবিরোধ ধ্বংসশীল সৃষ্টিরই বৈশিষ্ট্য এবং তা সৃষ্টিতেই হয়ে থাকে (শ্রষ্টার জ্ঞানে নয়)।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মাখলুককে কুফর ও ঈমান থেকে সুষ্ঠুরূপে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এগুলোকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন। সুতরাং **কাফির নিজ কর্ম, অস্বীকার এবং সত্য থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে কাফির হিসেবে পরিগণিত। তাদের এ কুফর (অবাধ্যতা) আল্লাহ তায়ালাকে ত্যাগ করার কারণেই।** আর মুমিন ও মুসলমান নিজ কর্ম, স্বীকৃতি ও সত্যকে গ্রহণের নিমিত্ত ঈমানদার হয়েছে। এ ঈমান আল্লাহ তায়ালার তাওফীক এবং তার জন্য তঁর সাহায্যের কারণে নসিব হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আদমের (আঃ) বংশধরদের তাঁর পিষ্ঠ থেকে সন্তানের আকৃতিতে বের করে জ্ঞানবান ও বোধশক্তি সম্পন্ন হিসেবে তৈরি করেছেন। অতঃপর সম্বোধন করে তাঁদের ঈমান গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কুফর থেকে নিষেধ করেছেন। তখন সকলেই তাঁর রাবুবিয়্যতের (প্রভূত্ব) স্বীকার করেছেন। এ ভিত্তিতে আদমের বংশধরদের থেকে কতেক (লোক) ঈমানদার হয়েছে। অতঃপর তারা এ ঈমানী ফিতরাতের (স্বাভাবিকত্ব) উপর সৃষ্টি হতে লাগলো।

এরপর যারা কুফর করেছে তারা ঈমানী ফিতরাতে পরিবর্তন সাধন করেছে। আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তারা তাতে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী থেকেছে।

আর আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে ঈমান ও কুফরের উপর শক্তি প্রয়োগ করেন না। আর তিনি সৃষ্টিগতভাবে কাউকে মুমিন-কাফির হিসেবেও সৃষ্টি করেননি। কিন্তু তিনি তাদের নিষ্ঠাবান মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন।

ঈমান ও কুফর বান্দাদেরই কর্ম। আল্লাহ্ তায়ালা ভালভাবেই জানেন যে, নিজ কুফর অবস্থায় কোন্ বান্দা কুফর করছে। এরপর বান্দা যখন ঈমান গ্রহণ করে, তখন সে তার ঈমানের অবস্থা জেনে নেয় এবং তা অটুটও রাখে। কিন্তু তার জ্ঞান ও গুণে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

বান্দার সকল কর্ম, নড়াচড়া ও নীরবতা এবং তার সকল উপার্জন সৃষ্টিকারী মূলতঃ আল্লাহ্ তায়ালা। এসবই তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, ভাগ্য এবং নিয়তির অন্তর্ভূক্ত। আর প্রত্যেক পূণ্য আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম, তাঁর মহব্বত ও সন্তুষ্টি, জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং তাঁর নিয়তি (তাকুদীর) দ্বারা প্রমাণিত। আর কুকর্ম সমূহও তাঁর জ্ঞান, নিয়তি এবং ইচ্ছার মধ্যে গণ্য। তাঁর মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং নির্দেশ এগুলোর সাথে সম্পর্কিত নয়।

সকল আম্বিয়া কিরাম আলায়হিমুস সালাম কবীরা, সগীরা, কুফর এবং সব ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পাক-সাফ ও পবিত্র। সকলের ঐকমত্যে তাঁদের থেকে পদস্খলন ঘটেছে। আর সৈয়দে আলম হুজুর নবীয়ে করীম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবীব, তাঁর খাস বান্দা, নবী ও রাসুল। তিনি পবিত্র, নিষ্পাপ এবং নিষ্কলংক। তিনি মুহুর্তের জন্যও মূর্তি পুজার ইচ্ছাও করেননি। আর না তিনি আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক স্থির করেছেন, আর না কোন সময় কখনো সগীরা ও কবীরা গুণাহের ইচ্ছা করেছেন। তাঁর উপর আল্লাহ তায়ালার দরুদ ও সালাম এবং সবাইর উপর।

আম্বিয়া কিরাম আলায়হিমুস সালামের পর সকল লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন-'হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু, অতঃপর হযরত ওমর বিন খাত্তাব আল-ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু, এরপর হযরত ওসমান ইবনে আফফান যুন্নুরাঈন রাদি আল্লাহু আনহু, তৎপর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব আল-মুরদাতা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু। এরা সবাই আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতকার, সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত, এবং সত্যপন্থীদের সাথে অবস্থানকারী ছিলেন। আমরা তাঁদের সবারই সাথে ভালবাসা ও মহব্বত রাখি।'

"আর আমরা কোন রাসুলের সাহাবীদের স্মরণ উত্তমতার সাথে ব্যতীত করিনা। আর না কোন গুনহের কারণে কোন মুসলমানকে কাফির বলে সাব্যস্থ করি। যদিও তা কবীরা গুনাহ্ তথা মহাপাপই হোক, যদি সে তা বৈধ জ্ঞান না করে। এর দ্বারা আমরা ঈমানের নাম-নিশানা দূরীভূত করিনা। আমরা এদের প্রকৃত মুমিন নাম দিয়ে থাকি। কেননা, মুমিন ফাসিক হওয়া বৈধ আছে, কাফির নয়।"

চামড়ার মোটা মোজায় মাসেহ করা সুন্নাত। আর রমযান মাসের রাত্রে তারাবীহ নামাজ সুন্নাত। আমরা বলছিনা যে, মুসলমানদের পাপ স্পর্শ করেনা, আমরা এও বলছি না যে, পাপীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর না আমরা এটা বলছি যে, তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। যদিও তারা ফাসিক হয় কিন্তু দুনিয়া থেকে ঈমানদার অবস্থায় মারা গিয়েছে। আমরা এটাও বলছিনা যে, আমাদের সৎকর্মসমূহ গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে গিয়েছে যেমন মারজিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু আমরা বলে থাকি, যে সৎকর্ম করেছে, তার উপর অর্পিত শর্তাবলী পুরণ করেছে এবং তা মারাত্মক ধ্বংসকারী দোষ-ত্রুটি, বাতিল (ভ্রান্ত) মর্মার্থ থেকে মুক্ত হবে, তা কুফর ও ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে বাতিল ঘোষণা করেনি, শেষ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে মুমিন ও মুসলমান হিসেবে বিদায় হয়েছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তার সৎকর্ম নষ্ট করে না। বরং তা কবুল করে এর সাওয়াব ও পূণ্য তাকে প্রদান করবে। শিরক ও কুফর ব্যতীত আর যত পাপই হোক না কেন, পাপী মুসলমানগণ মুমিন ও মুসলমান মৃত্যুর সময় তা থেকে তাওবা না করে, তাহলে তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন আবার শুরু থেকে শাস্তি প্রদান নাও করতে পারেন।

রিয়া (লৌকিকতা প্রদর্শন) যখন কোন কর্মে সংঘটিত হয়ে যায়, তখন তা পূণ্যকে বাতিল করে দেয়। এ অবস্থায়ই অহংকার ও আত্মগর্বের।

হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম-এর জন্য মু'জিজা প্রমাণিত রয়েছে আর কারামাত আওলিয়ায়ে কিরামের জন্য হক ও সঠিক। কিন্তু ঐসব অস্বাভাবিক কর্ম আল্লাহর শত্রুদের থেকেও প্রকাশ পেয়েছে যেমন শয়তান, ফেরআউন ও দাজ্জাল প্রমুখ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের থেকে এমনি সংঘটিত হয়েছে, এমন সংঘটিত হবে। সুতরাং তা আমরা না মোজেজা বলবো, না কারামাত। বরং আমরা তা তাদের জন্য 'ক্বাযায়ে হাজত' নামে আখ্যায়িত করবো। আর আমাদের এ নামে আখ্যায়িত করা এ ভিত্তিতে যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিজ শত্রুদের জন্য দুনিয়াতে ইসতিদ্‌রাজ (কুদরতী কানুনের বিপরীত কথা যা অমুসলিমদের থেকে প্রকাশ পায়) পদ্ধতিতে এবং পরকালে তাদের শাস্তির জন্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন। তখন সে নিজে নিজে খুশী হয়ে যায়, আর অবাধ্যতা ও কুফরে আরো কঠোরতা অবলম্বন করে। আর এসবগুলো বৈধ ও সম্ভব।

আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টিজগত সৃষ্টির পূর্বেও সৃষ্টিকর্তা, জীবিকা প্রদানের পূর্বেও জীবিকা প্রদানকারী (রাজ্জাক) ছিলেন। **পরকালে আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের স্বীয় দীদার দ্বারা ধন্য করবেন, আর সকল মুসলমান তাঁর দর্শন দ্বারা মহিমান্বিত হবেন। যদিও তারা তাঁকে জান্নাতে স্বচক্ষে দৃষ্টান্ত ও আকৃতিবিহীন প্রত্যক্ষ করবে।** তখন আল্লাহ ও মাখলুকের মধ্যখানে কোন দূরত্ব থাকবে না।

ঈমান হলো, মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক স্বীকৃতির নাম। আসমান ও জমীনের অধিবাসীদের ঈমান মুমান বিহি مؤمن به (যার উপর ঈমান আনা হয়েছে)-এর ভিত্তিতে বেশীও হয় না, কমও হয় না। নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে তারতম্য হয়ে থাকে। সকল মুসলমান ঈমান ও তাওহীদে এক সমান। অবশ্যই আমলের ক্ষেত্রে পরস্পরের উপর মর্যাদা রয়েছে।

আর ইসলাম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশসমূহের পূর্বে, বশ্যতা, আনুগত্য স্বীকার এবং আত্মসমর্পন করার নাম। সুতরাং **অভিধানিক দৃষ্টিতে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কিন্তু ঈমান ইসলাম ব্যতীত হয় না, আর না ইসলাম ঈমান ব্যতীত পাওয়া যায়। এ উভয় উদরের সাথে পৃষ্ঠের সম্পর্কের ন্যায়। আর দ্বীন, ঈমান ও ইসলাম পূর্ণ শরীয়তের নাম।**

আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করি যেভাবে তাঁর পরিচয় লাভের হক রয়েছে। যেভাবে তিনি স্বীয় কিতাবে (কুরআনে) তাঁর নিজের সত্ত্বাকে নিজের সকল গুণাবলীর সাথে উল্লেখ করেছেন। কোন বান্দা এমন শক্তি ও সামর্থ রাখেনা যেভাবে তাঁর ইবাদতের হক রয়েছে এবং যার সে উপযোগী তার ইবাদত করবে কিন্তু তাঁর নির্দেশের মাধ্যমেই তাঁর ইবাদত করবে যেমন তিনি স্বীয় কিতাব ও তাঁর রাসুল সুন্নাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আর প্রত্যেক মুসলমান মারিফাত, ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল, মোহাব্বত, সন্তুষ্টি, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙখা ও ঈমান ইত্যাদিতে একই সমান। ঈমান ব্যতীত অন্যান্য সবকর্মে ভিন্ন। **আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ। কখনো তিনি নিজ বান্দার অধিকারের চেয়েও কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নিজ করুণায় তাদের পূণ্য প্রদান করেন।** আর কখনো পাপের উপর নিজ ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন আবার কখনো নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করেন।

"আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমুস সালামের শাফায়াত সঠিক (হক)। আর আমাদের প্রিয় নবী বিশ্বকুল সরদার হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত পাপী ও গুনাহ্গার মুসলমান এমনকি কবীরা গুনাহকারী মুসলমানদের জন্যও প্রমাণিত রয়েছে যারা শাস্তির উপযোগী।"

আর ক্বিয়ামত দিবসে মীজানে (দাঁড়িপাল্লা) আমলসমূহ পরিমাপ করা হক। আর রাসুলে পাক (দঃ)-এর হাউজ হক।

আর ঝগড়াটে লোকদের মধ্যে পূণ্যসহকারে প্রতিদান প্রদান করা হক। যদি তাদের কোন পূণ্য না থাকে, তাহলে তাদের আমলনামায় পাপ অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হক ও জায়েজ। **জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় এখনও সৃষ্ট রয়েছে। এ দু'টো কখনো ধ্বংস ও ফানা হবেনা। আর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আর আল্লাহ তায়ালার শাস্তি ও তাঁর পূণ্য কখনো ধ্বংস হবেনা।** আল্লাহ তায়ালা নিজ করুণায় যাকে ইচ্ছা হেদায়েত প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায়-পরায়ণতার মাধ্যমে ভ্রষ্টতার অতল গহবরে নিক্ষেপ করেন। তিনি অতল গহবরে নিক্ষেপ করা, আর তাকে ছেড়ে দেয়া হলো 'খাযলান'। খাযলান-এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় বান্দাকে নিজ রেযা ও সন্তুষ্টির দিকে তওফীক দিবেনা। এটা তাঁর আদল ও ইনসাফ। অনুরূপ পাপীর অপমানের উপর শাস্তি প্রদান করেন। আমাদের জন্য এটা বলা

বৈধ নয় যে, শয়তান মুমিন বান্দার ঈমান জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আমরা এটা বলতে পারবো যে, বান্দা যখন ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তার ঈমান উঠিয়ে নেয়।

কবরে মুনকির-নকীরের যে সাওয়াল হবে তা সঠিক। বান্দার শরীরে তার কবরে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হক। কবরের চাপ এবং এর শাস্তি সত্য। এসবগুলো কাফির ও কতেক পাপী মুসলমানদের জন্য।

আর প্রত্যেক ঐ বস্তু যা সম্মানিত ওলামা কিরাম ফার্সী ভাষায় আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতম গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, তা বলা জায়েজ আছে। কিন্তু 'ইয়াদ' (হাত) শব্দটি ব্যতীত। তা ফার্সী ভাষায় বলা যাবে। আর আকৃতি ও দৃষ্টান্ত বিহীনভাবে আল্লাহ তায়ালার 'চেহারা মোবারক' বলা জায়েজ আছে। আল্লাহতায়ালা থেকে নৈকট্য ও দূরে অবস্থান করা বৃদ্ধি-হ্রাসের তারতম্যের ভিত্তিতে নয়। কিন্তু এটা কারামত ও অস্বাভাবিকত্বের ভিত্তিতে। আর আনুগত্যশীল বান্দা আকৃতিহীনভাবে তাঁর নিকটে, পাপী ও অবাধ্য বান্দা আকতিহীনভাবে তাঁর থেকে দূরে। নিকটে, দূরে ও অগ্রে হওয়া প্রার্থনাকারীদের জন্য বলা হয়ে থাকে। আর জান্নাতে তাঁর পাশে অবস্থান এবং তাঁর (আল্লাহ) সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াও দৃষ্টান্ত এবং আকৃতিহীনভাবে।

পবিত্র কুরআন করীম রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে আর তা মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর কুরআন করীমের সকল আয়াত কালামের অর্থের দিক দিয়ে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে সবই সমান। তবে কুরআনের কতেক আয়াত সম্পর্কে যিক্র এবং যিকরকৃত উভয়ের ফযিলত উল্লেখ রয়েছে। যেমন আয়াতুল কুরসী। কেননা, এতে আল্লাহ তায়ালার ভীতি, মহানত্ব, মর্যাদা এবং তাঁর গুণাবলী বিধৃত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে উভয় ফযীলত অর্থাৎ যিক্র ও ফযীলতের সমাবেশ ঘটেছে। কতেক আয়াতে শুধুমাত্র ফযীলত উল্লেখ আছে যেমন কাফেরদের কাহিনী, আর তাতে উল্লিখিতদের জন্য কোন ফযীলত নেই। কেননা, তারা কাফের। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার সকল নামসমূহ, গুণাবলী ও মাহাত্ম্য, মহানত্ব ও মর্যাদায় সমান। এ উভয়টায় কোন পার্থক্য নেই।

হযরত কাসিম, তাহির ও ইব্রাহীম রাদি আল্লাহু আনহুম রাসুলে সৈয়দ আলম হুজুর পুরনূর (দঃ)-এর সন্তান ছিলেন। আর সৈয়দা ফাতেমা, **রুক্বায়্যাহ্ যয়নব ও উম্মে কুলসূম রাদি আল্লাহু আন্হুন্না রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদী ছিলেন।**

আর মানুষের যখন আল্লাহ্ তায়ালার তাওহীদের সূক্ষ্মতা ও মূল রহস্য সম্পর্কে কোন সন্দেহে পতিত হয়, তাহলে তার উপর অপরিহার্য সে, ঠিক যে মুহূর্তে এর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা যা আল্লাহর নিকট সঠিক। শেষ পর্যন্ত যদি কোন দক্ষ আলিম পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে নেয়া। আর সন্দেহের মুহূর্তে সন্ধানে বিলম্বের কোন অবকাশ নেই আর সে অবস্থায় নিশ্চুপতা অবলম্বন করা ওজর নয়। যদি নিশ্চুপতা অবলম্বন করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে।

আর মিরাজের ঘটনা হক ও সঠিক। সে তার অস্বীকার করবে সে বিদ্আতী ও ভ্রষ্ট। আর দজ্জালের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, আসমান থেকে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন এবং ক্বিয়ামত দিবসের ঐসব নিদর্শন তা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক এবং সংঘটিত হবেই। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছে সঠিক ও সরল পথের দিকে হিদায়ত প্রদান করে থাকেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

টীকা ঃ ১

জান্নাত এমন একটি বাসস্থান, যা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জন্য তৈরী করেছেন। হাদিস শরীফে আছে, সেখানকার কোন মহিলা যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মেরে দেখে, তাহলে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত আলোকিত হয় যাবে, সমগ্র এলাকা সুগন্ধময় হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে যাবে। তাঁদের ওড়নার সাথে তুলনা করার মতও দুনিয়াতে কিছু নেই। (মিশকাত শরীফ ৪৯৫ পৃঃ)

অন্যত্র বর্ণিত আছে, যদি কোন হুর জমিন ও আসমানের মাঝখানে হাত বের করে, তাহলে এর সৌন্দর্যের মোহে দুনিয়ার সবাই মাতোয়ারা হয়ে যাবে, আর ওড়না প্রদর্শন করলে তার রূপের সামনে সূর্য এমন হয়ে যাবে, যেমন সূর্যের সামনে চেরাগ। বেহেশতের নখ পরিমাণ কোন জিনিসও যদি দুনিয়াতে প্রকাশ করা হয়, তাহলে আসমান-জমিনের সবকিছু এর দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেহেশতের কোন মহিলার কঙ্কণ যদি দুনিয়াতে প্রদর্শিত হয়, তাহলে সূর্যের আলো এমনভাবে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যেমনি ভাবে সূর্যের দ্বারা তারকারাজির আলো বিলীন হয়ে যায়। (মিশকাত শরীফ ৪৯৭ পৃঃ)

বেহেশতের আয়তন সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞাত। তবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত এ টুকুই জানা যায় যে, এক একটি বেহেশতের একশটি দরজা হবে এবং প্রত্যেক দরজার আয়তন হবে আসমান-জমিনের দূরত্বের সমতূল্য। আর যে দরজার রেওয়ায়েত স্মরণ নেই, সেটার আয়তন কতটুকু, তা বলা মুস্কিল। তবে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সমস্ত বিশ্বের জন্য একটি দরজাই যথেষ্ট। বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়া কোন দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ারী একশ বছরেও অতিক্রম করতে পারবেনা। বেহেশতের দরজাসমূহ এত প্রশস্ত হবে যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষে দরজার এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে যেতে সত্তর বছর সময় লাগবে। তবুও প্রবেশকারীদের এত ভিড় হবে যে, এদিক সেদিক ফেরার অবকাশ থাকবে না। বেহেশতের দরজা অতি ভিড়ের কারণে মরমর শব্দ করবে। ওখানে নানা প্রকারের মনিমুক্তা খচিত প্রাসাদসমূহ রয়েছে। সেগুলো এমন স্বচ্ছ ও পরিস্কার যে, বাইর থেকে ভেতরের অংশ এবং ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায়। বেহেশতের দেয়ালগুলো সোনা-চাঁদির ইট ও মিশকের সিমেন্ট দ্বারা তৈরী। একটি স্বর্ণের ইটের পর একটি চাঁদির ইট, এভাবে দেয়ালের গাঁথুনি হয়েছে। আর প্রাসাদের মেঝটা হচ্ছে জাফরান ও মণিমুক্তার পাথর দ্বারা তৈরী। (মিশকাত শরীফ ৭৯৭ পৃঃ)

অন্য এক হাদিসে আছে- 'আদন বেহেশতের দালানের একটি ইট শ্বেত বর্ণ মুক্তার, অপরটি লাল ইয়াকুত পাথরের, আর একটি জমরূদ বা পাতলা সবুজ পাথরের এবং এগুলোকে মিশক দ্বারা জোড়া লাগানো থাকবে। বেহেশতে ঘাসের পরিবর্তে জাফরানই থাকবে আর মাটিটা হবে মুক্তার কঙ্কর ও আম্বর দ্বারা তৈরী। বেহেশতে ষাট মাইল উচ্চতা বিশিষ্ট মুক্তা খচিত একটি তাঁবু থাকবে। (মিশকাত শরীফ ৪৯৬ পৃঃ)

বেহেশতে যথাক্রমে পানি, দুধ, মধু ও শরাবের চারটি সাগর আছে। এসব সাগর থেকে ছোট-ছোট নদী উৎপত্তি হয়ে প্রতিটি প্রাসাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ওখানকার নদীনালা মাটি খনন করে প্রবাহিত হবে না; বরং মাটির উপর দিয়েই প্রবাহিত হবে। এর এক পার্শ্ব হবে মুক্তার তৈরী এবং অপর পার্শ্ব হবে ইয়াকুত পাথরের তৈরী। আর মাটিটা খাঁটি মেশকের তৈরী। ওখানকার শরাব দুনিয়ার শরাবের মত নয়। দুনিয়ার শরাবে দুর্গন্ধ ও নেশা আছে, শরাবীগণ হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও রাস্তাঘাটে মাতলামী করে। এসব থেকে বেহেশতী শরাব মুক্ত ও পবিত্র। বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে সব রকমের সুস্বাদু খাবার পাবে। যেটা খেতে ইচ্ছে করবে, সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। কোন পাখী দেখে যদি এর মাংস খেতে ইচ্ছে হয়, তখনই ওটা ভুনা মাংস হয়ে সামনে এসে যাবে। পানি ইত্যাদি পান করার চাহিদা মোতাবেক পানি বা দুধ বা শরাব অথবা মধু হবে। চাহিদার অতিরিক্ত এক ফোঁটাও হবে না। পান করার পর নিজ থেকেই যেখান থেকে এসেছে, সেখানে চলে যাবে। বেহেশতে ময়লা-আবর্জনা, পায়খানা-প্রশ্রাব, থুথু, নাক-কানের ময়লা কিছুই থাকবে না। (মিশকাত শরীফ ৪৯৬ পৃঃ)

খাওয়ার পর এক প্রকার তৃপ্তিদায়ক ঢেকুর আসবে এবং সুর্গন্ধময় ঘাম বের হবে। তদ্বারা খাদ্য হজম হয়ে যাবে। ঢেকুর ও ঘাম থেকে মেশকের সুগন্ধি বের হবে। প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে একশ জন পুরুষের পানাহার ও সহবাসের শক্তি দেয়া হবে। (মিশকাত শরীফ ৪৯৭ পৃঃ)

টীকা ঃ ২

দোযখ হলো আল্লাহর কহর, গজব এবং শাস্তির চূড়ান্ত প্রকাশ স্থল। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন দোযখ আল্লাহকে বলে- হে আল্লাহ! এতো আমার থেকে পানা চাচ্ছে, তুমি তাকে পানা দাও। কুরআন শরীফে অনেকবার বর্ণিত হয়েছে- 'জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক, দোযখকে ভয় কর।' আমাদের আকা ও মওলা হুযুর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এর থেকে পরিত্রাণের জন্য বেশী করে প্রার্থনা করতেন।

জাহান্নামের অগ্নিশিখা সুউচ্চ অট্টালিকার সম পর্যায়ে উঠবে। দূর থেকে মনে হবে যেন পাণ্ডু এবং এর উটের পাল আসছে। মানুষ আর পাথরই হবে দোযখের ইন্ধন। (মিশকাত শরীফ ৫০৬ পৃঃ)

তাপমাত্রার দিক দিয়ে দুনিয়ার আগুন হচ্ছে দোযখের আগুনের এক সত্তরাংশ। যার সর্বনিম্ন আযাব হবে, তাকে এক প্রকার আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ ডেক্‌সিতে ফুটন্ত পানির মত টগ্‌বগ্ করবে। তার মনে হবে যে, তার উপরই সবচেয়ে বেশী আযাব হচ্ছে, অথচ তার আযাবটা খুবই নগণ্য। (মিশকাত শরীফ ৬০২ পৃঃ)

যার প্রতি সবচেয়ে নগন্য আযাব হবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন- আচ্ছা! যদি সমস্ত দুনিয়া তোমার হয়ে যায়, তা কি তুমি এ আযাব থেকে রেহাই পাবার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে? সে আরয করবে- হ্যাঁ নিশ্চয়।' আল্লাহ বলবেন- তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, আমি তোমাকে এর জন্য অনেক সহজ কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম অর্থাৎ কুফরী না করার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তা শোননি। (মিশকাত শরীফ ৫০৬ পৃঃ)

দোযখের আগুন হাজার বছর জ্বালানোর পর একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল, আবার হাজার বছর জ্বালানোর পর সাদা হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় হাজার বছর জ্বালানোর পর একেবারে কালো হয়ে

গিয়েছিল। বর্তমান সেই কালো অবস্থায় আছে; কোন আলোর নামগন্ধ নেই। (মিশকাত শরীফ ৫০৩ পৃঃ)

হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমাদের নবী করীম আলাইহিস্ সালামের কাছে কসম করে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দোযখ থেকে সূঁচের মাথা বরাবর কিছু অংশ পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়, তাহলে সমস্ত বাসিন্দা এর ভয়ে মারা যাবে। তিনি শপথ করে আরও বলেছেন যে, যদি দোযখবাসীদের শিকলের একটি আংটা পৃথিবীতে পাহাড়সমূহের উপর রাখা হয়, তাহলে পাহাড়সমূহ কাঁপতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড় জমিনের নীচে ধ্বসে যাবে। এ পৃথিবীর আগুনও (যার গরম ও উষ্ণতা সম্পর্কে কেও অবগত নয় যে, গ্রীষ্মকালে এর কাছে যেতেও ভয় লাগে) খোদার কাছে প্রার্থনা করে যেন একে দোযখে ফিরিয়ে না নেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মানুষ জাহান্নামে যাবার কাজ করছে এবং সেই আগুনকে ভয় করছে না, যাকে দুনিয়ার আগুনও ভয় করে এবং এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

দোযখের গভীরতা কতটুকু, তা আল্লাহই জানেন। তবে হাদীছ শরীফে এটুকুই বর্ণিত আছে যে, যদি বড় আকারের পাথর জাহান্নামের কিনারা থেকে তথায় নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সত্তর বছরেও তলদেশে পৌছতে পারবে না। কিন্তু যদি মানুষের মাথার বরাবর একটি সীসার গোলা আসমান থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সন্ধ্যা হবার আগেই পৃথিবীতে পৌছে যাবে। (মিশকাত শরীফ-প্রাগুক্ত)

অথচ এটা পাঁচশ বছরের পথ। আর ওখানে বিভিন্নস্তর, ভয়াল বনাঞ্চল ও কুয়া থাকবে। কতেক ভয়াল বনাঞ্চল এমন যে, জাহান্নামও প্রতিদিন সত্তরবার থেকে অধিক এর থেকে পানাহ চায়। এটা কেবল দোযখের আকৃতি বর্ণিত হলো। এর মধ্যে অন্য আযাব না হলেও চলতো। কিন্তু কাফিরদের শাস্তির জন্য নানা রকম আযাবের ব্যবস্থা আছে। লোহার এমন ভারী মুগুর (গদা) দিয়ে ফিরিশতাগণ ওদেরকে মারবে, সেই গদা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জ্বীন একত্রিত হয়েও উঠাতে পারবে না। বুখতি নামক বড় আকারের উটের গলার সমান এক একটি বিচ্ছু হবে আর সাপ যে কত বড় ও কি ধরণের বিষাক্ত হবে, আল্লাহই জানেন। একবার কামড় দিলে এর বিষক্রিয়া ও ব্যথা হাজার বছর পর্যন্ত থাকবে। (মিশকাত শরীফ ৫০৩ পৃঃ)

পোড়া তেলের তলানীর মত ভীষণ উষ্ণ-ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। এ পানি মুখের কাছে নিতেই এর গরমে মুখের চামড়া ঝলসে যাবে। তদুপরি মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে। দোযখবাসীদের শরীর থেকে পুঁজ বের হবে, তা তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে এবং কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ তাদেরকে খেতে দেয়া হবে। ঐ গাছটা এ রকম হবে যে, এর যৎসামান্য দুনিয়াতে পতিত হলে দুনিয়ার সমস্ত খাদ্য দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হয়ে যাবে। এ খাদ্য তাদের গলায় আটকে যাবে। তারা একে অপসারিত করার জন্য পানি চাইবে। তখন তাদেরকে সেই ফুটন্ত পানি দেয়া হবে, যা মুখের কাছে নিতেই মুখের চামড়া গলে সেই পানিতে পতিত হবে। আর পেটের মধ্যে যা ঢুকবে, তা নাড়িভুঁড়িকে টুকরা টুকরা করে দেবে এবং সুরুয়ার মত রান বেয়ে পতিত হবে। এ ধরণের পানির প্রতিও তারা পিপাসাকাতর উটের পালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতঃপর কাফিরেরা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পরস্পর শলা পরামর্শ করে দোযখের ফিরিশতা মালেক (আঃ) কে আহবান করে বলবে– "আপনার খোদাকে বলুন, আমাদেরকে মেরে ফেলুক। তিনি এক হাজার বছর নিশ্চুপ থাকার পর বলবেন, আমাকে বলে লাভ কি, যার নাফরমানি করেছ, তাকেই বল। তখন তারা আল্লাহর বিভিন্ন গুণের প্রশংসা করে এক হাজার বছর পর্যন্ত ডাকতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ কোন উত্তর দেবেন না। এক হাজার বছর পর আল্লাহ যে উত্তর দেবেন, তা হলো– 'দূর হও, জাহান্নামে পড়ে থাক, আমার সঙ্গে কথা বল না।' তখন তারা সমস্ত আশা ভরসা থেকে নিরাশ হয়ে গাধার আওয়াজের মত চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। প্রথম প্রথম চোখের পানি বের হবে। পানি শেষ হলে রক্ত বের হবে। কাঁদতে কাঁদতে চেহারায় গুহার মত গর্ত হয়ে যাবে। চোখের পানি, রক্ত ও পুঁজ এত অধিক হবে যে, এর উপর দিয়ে নৌকা চলাচল করতে পারবে। দোযখবাসীদের আকৃতি এমন বিভৎস হবে যে, যদি দুনিয়াতে সেই আকৃতির কোন জাহান্নামীকে আনা হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত লোক তার বিকৃত চেহারা ও দুর্গন্ধের কারণে মৃত্যুবরণ করবে। ওদের শরীরকে এত বড় করে দেয়া হবে যে, তাদের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের বিস্তৃতি হবে দ্রুত ঘোড়সওয়ারীর তিন দিনের পথ। এক একটি দাঁত ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হবে। আর গায়ের চামড়ার পুরুত্ব হবে বিয়াল্লিশ হাত। ওদরে জিহ্বা তিন-চার মাইল লম্ব হবে যা মাঠিতে হেঁচড়াতে থাকবে এবং অন্যরা পদদলিত করবে। মক্কা মদীনার দূরত্বের সমপরিমাণ হবে তাদের বসার জায়গা। (মিশকাত শরীফ ৫০৩ পৃঃ)

(বাহারে শরীয়ত থেকে উদ্বৃত)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অসিয়তনামায়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)

যুগের শ্রেষ্ঠ ও মহান ইমাম আমাদের সরদার আবু হানিফা নু'মান বিন সাবিত কুফী (রঃ)–এর ঐ ওসিয়তনামার অনুবাদ, যা তিনি স্বীয় সাথী এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) যখন রোগাক্রান্ত হলেন, তখন (সকলের উদ্দেশ্যে) বলেন 'হে আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উত্তম তাওফীক প্রদান করুন। জেনে রাখুন! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বারোটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে এ বারোটি বৈশিষ্ট্যের উপর ইস্পাত-কঠিনভাবে সুদৃঢ় থাকবে, সে না কখনো বিদআতী ও পথভ্রষ্ট হবে, না নিজ নাফস বা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো ঈমান। ঈমান মৌখিক-স্বীকৃতি এবং আন্তরিক সত্যায়নের নাম। কেবল মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান নয়। কেননা, যদি কেবল মৌখিক স্বীকৃতির নামই ঈমান হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে সকল মুনাফিক মুমিনের মধ্যে গণ্য হতো। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র আন্তরিক সত্যায়নের নাম ঈমান নয়। একারণে যে, যদি আন্তরিক সত্যায়নের নাম ঈমান হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে সকল কিতাবধারী ঈমানদাররূপে চিহ্নিত হতো। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ (আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ মিথ্যুক)। আর আহলে কিতাব সম্পর্কে বলেন– يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (তারা নবীকে খুব ভাল করে চিনে, যেভাবে স্বীয় সন্তানদের), আর ঈমানে বৃদ্ধি-হ্রাস হয় না। এ কারণে যে, ঈমানে প্রবৃদ্ধি এ ছাড়া ধারণাও করা যায় না যে, কুফরের হ্রাস পাবে। আর ঈমানে হ্রাস এ ছাড়া কল্পনাও করা যায় না যে, কুফরের প্রবৃদ্ধি হয়। অতএব, এটা কিভাবে সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি একই অবস্থায় মূলতঃ মুমিনও হবে এবং কাফিরও। মুমিনের ঈমানে কোন সন্দেহ নেই যেভাবে কাফিরের কুফরে সন্দেহ থাকতে পারে না। যেমন, মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– 'তারা সত্যিকার মুমিন আর এরা মূলতঃ কাফির।' রাসুলে খোদা (দঃ) –এর পাপী উম্মত মূলতঃ মুসলমান, তারা কাফির নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আমল। আমল ঈমান ব্যতীত আর ঈমান আমল ব্যতীত। এর প্রমাণ হলো, কতেক সময় মুমিন থেকে আফল উঠে যায় অর্থাৎ মুমিন আমল শুন্য হয়। সে সময় এটা বলা বিশুদ্ধ না যে, তার ঈমান চলে গেছে। যেভাবে হায়েজ ওয়ালা মহিলার দায়িত্ব থেকে নামায উঠে যায়। আর তার সম্পর্কে এটা বলাও জায়েয নেই যে, তার ঈমান চলে গেছে কিংবা ঈমান ত্যাগের কারণে তাকে নামায পরে আদায় করার জন্য বিলম্ব করে দেয়া হয়েছে। রাসুলে খোদা (দঃ) হায়েযযুক্ত মহিলাদের সম্পর্কে বলেছেন– 'রোযা ত্যাগ করো পরে তার ক্বাবা আদায় করবে।' এটা বলা জায়েজ নেই যে, ঈমান পরিত্যাগ করো, পরে আবার গ্রহণ করবে। এটা বলা জায়েয যে, ফকিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এটা বলা জায়েয নেই যে, ফকিরের উপর ঈমান ওয়াজিব নয়। আর যদি কেউ প্রকাশ্য বলে যে, তাক্বদীর, ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী। যদি সে তাওহীদের স্বীকৃত জ্ঞাপক হয় তাহলে তার তাওহীদ বাতিল বলে পরিমাণিত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা স্বীকার করছি যে, বান্দার সকল আমল তিন প্রকারের হয়ে থাকে। ফরীযা (অপরিহার্য), ফযীলা (মর্যাদা সম্পর্কিত), মা'সিয়্যাত (পাপ সম্পর্কিত), ফরয সম্পর্কিত আমলসমূহতো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ, তাঁর ইচ্ছা, মহব্বত-ভালবাসা, সন্তুষ্টি, কাযা, ক্বদর, তাঁর ইচ্ছা, তাওফীক্ব, তাখলীক, হুকুম তাঁর জ্ঞান এবং লাওহে তা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে।

এখন বাকী রইলো, ফযীলত সম্পর্কিত আমলসমূহ। এগুলো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ নয়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা, মহব্বত, সন্তুষ্টি, ক্বাযা, তাক্বদীর, তাওফীক্ব,

তাখলীক, ইরাদাহ, তাঁর হুকুম, জ্ঞান এবং লাওহে মাহফুজে তা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে।

পাপ সম্পর্কিত আমলসমূহ। এগুলো আল্লাহর নির্দেশ নয়। তবে তাঁর ইচ্ছার অন্তর্ভূক্ত। তাঁর মহব্বতের মধ্য থেকে নয়, এতে তার কথা এবং সন্তুষ্টির সম্পর্ক নেই। এটা তাক্বদীরের মধ্যে গণ্য, তাঁর তাওফীক থেকে নয়। এটা তার খাযলানের কারণে। তাকে এগুলোর জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য যে, তা তাঁর জ্ঞান এবং লাওহ-ই মাহফুজে তার লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর উপবিষ্ট (যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয়) এছাড়া যে, তাঁর এর অপরিহার্যতা এবং এর উপর তার ইস্তিক্বরার (স্থির) –এর প্রয়োজন হয়, তিনি আরশ এবং অন্যান্য সবকিছুর হেফাজতকারী ও রক্ষক। সুতরাং যদি তিনি মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে তিনি সকল সৃষ্টি জগৎ তৈরী করতেন না। আর না এর তদবির করতে পারতেন। যেমন মাখলুকের অবস্থা। আর যদি তিনি বসা এবং স্থির থাকার প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন। সত্য কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা এ থেকে পাক ও পবিত্র, এ থেকে তিনি অনেক দূরে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা স্বীকার করছি যে, কুরআন কারীম আল্লাহ তায়ালার কালাম, তাঁর ওহী, তাঁর অবতারণকৃত এবং তাঁর গুণ (সিফাত), না তার মূল, না অন্য কিছু। বরং বিশ্লেষিত যে, এটা তাঁর গুণ। এ কুরআন মাসহাফসমূহে লিখিত, সকলের মুখে মুখে প্রচলিত, অন্তরসমূহে রক্ষিত। কুরআনের বর্ণ, কালি, কাগজ এবং লেখা সবই সৃষ্টি। এ জন্য যে, এটা বান্দাদের আমল। আর আল্লাহ তায়ালার কালাম মাখলুক নয়। এ কারণে যে, লেখন, বর্ণ, শব্দ এবং আয়াতসমূহ ইত্যাদি সবই কুরআনের যন্ত্র এবং আসবাব। কেননা, বান্দা কুরআন পাঠের সময় ঐসব অসবাব এবং যন্ত্রের মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তায়ালার কালাম তাঁর সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং এর অর্থ তাঁর মাধ্যমসমূহ দ্বারা বুঝা যায়। যে ব্যক্তি বলে, **"আল্লাহ তায়লার কালাম মাখলুক তাহলে সে কাফির এবং আল্লাহ তায়ালার অস্বীকারকারী।"** আল্লাহ হলেন মা'বুদ, উপাস্য এবং চিরস্থায়ী যেভাবে পূর্ব থেকে ছিলেন। আর তাঁর কালাম বান্দার মুখে মুখে প্রচলিত, লিখিত এবং সংরক্ষিত। তিনি এর থেকে পবিত্র যে, তাঁর সত্ত্বা থেকে ক্ষীয়মান। বরং তাঁর সত্ত্বা ধ্বংসহীন এবং চিরন্তন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা স্বীকার করছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) –এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু, অতঃপর হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু, তারপর ওসমান যুন্নুরায়ন (রঃ), এরপর হযরত আলী মুরতাদা রাদি আল্লাহু আনহু। এ কারণে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ (অগ্রবর্তীগণ অগ্রেই, এরাই জান্নাতের কাননে নৈকট্যশীল হবে।)যিনি সর্বাগ্রে তিনি সর্বোত্তম। আর প্রত্যেক পরহেযগার মুসলমান তাদের সবাইর সাথে ভালবাসা রাখেন। আর প্রত্যেক দুর্ভাগা মুনাফিক তাঁদের সাথে হিংসা ও শত্রুতা রাখে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

আমরা স্বীকার করছি যে, বান্দাকে নিজ আমল, স্বীকৃতি এবং মা'রিফাত দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যখন এ কর্মকারীকে স্বীয় কর্ম দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে সে প্রথমেই কেবল মাখলুকই হবে এবং ক্ষমতাহীনই হবে। কেননা, তারা সবাই দুর্বল এবং অক্ষম। আল্লাহ তার সৃষ্টিকর্তা এবং জীবিকা প্রদানকারী। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি তোমাকে মৃত্যু প্রদান করবেন; তারপর জীবিত করবেন।'

জ্ঞানের মাধ্যমে উপার্জন করা বৈধ। আর বৈধ পন্থায় সম্পদ জমা করাও বৈধ আর অবৈধ পন্থায় সম্পদ কুক্ষিগত করা হারাম।

মানুষ তিন শ্রেণীর। এক মুমিন যারা নিজ ঈমানে একনিষ্ঠ। দুই কাফির যারা স্বীয় কুফরে সুদৃঢ়। তিন মুনাফিক, যারা স্বীয় নিফাকে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর আমল ফরয করেছেন। আর কাফেরদের উপর ঈমান এবং মুনাফিকদের উপর ইখ্‌লাস (একনিষ্ঠতা)। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন)– يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ এর মর্ম হলো, হে মুসলমানগণ ও ভাল আমল করো। আরো ইরশাদ করেন يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آمِنُوا (হে কাফিরগণ ঈমান আনো।) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نَافَقُوا أَخْلِصُوا (হে মুনাফিক একনিষ্ঠ হও।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ

অষ্টম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সত্যায়ন করছি যে, কর্মের সাথে ইসতেত্বাআত (ক্ষমতা) কর্মের পূর্বে– পরে নয়। এ কারণে যে, যদি কর্মের পূর্বে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বান্দা কর্মের সময় আল্লাহর কাছ থেকে পেরোয়া হয়ে যাবে। আর এটা কুরআনের বিপরীত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন আর তোমরা মুখাপেক্ষী।) আর যদি কর্ম পরে হয় তাহলে ক্ষমতাহীন কর্ম হাসিল হওয়া অসম্ভব।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ

নবম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সত্যায়ন করছি যে, চামড়ার মোজায় মুকিমের জন্য একদিন একরাত্রের, আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত্রের জন্য মাসেহ করা জায়েয। এজন্য যে, হাদীসে এভাবেই উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং যে তা অস্বীকার করে তার কুফরে সম্পৃক্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা, এ হাদীস মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। আর সফরাবস্থায় নামাযে কৃসর অর্থাৎ চাররাকাত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত পাড় এবং রোযা রেখে ইফতার করা কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তাহলে এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নামায কসর করো।" আর ইফতার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ– 'তোমাদের মধ্যে যে রোগাক্রান্ত, কিংবা সফরে তাহলে সে অন্য সময়ে কেবল ঐ দিনের নামাযই কাযা আদায় কর।'

দশম পরিচ্ছেদ ঃ

দশম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সত্যায়ন করছি, আল্লাহ তায়ালা কলমকে লিখার নির্দেশ দিয়েছেন। কলম নিবেদন করলো, হে আমার প্রভু আমি কি লিখবো! ইরশাদ করেন, যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে সবই লিপিবদ্ধ করো। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান– 'এরা যা কিছু করছে সব আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে ছোট-বড় সবই লিখিত আছে।'

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ

আমরা সত্যায়ন করছি, কবর আযাব অবশ্যই হবে। আর মুনকার– নকিরের সাওয়ালও সঠিক। কেননা, এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। জান্নাত-জাহান্নাম সঠিক। এ উভয় সৃষ্ট রয়েছে। এ দু'টো ধ্বংস হবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন – فِي الْجَنَّةِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (জান্নাত মোত্তাকিদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।) জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে– أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (জাহান্নাম কাফেরদের জন্য সৃষ্ট)। আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাত-জাহান্নাম পূণ্য ও শাস্তির জন্য সৃষ্টি করেন। মিযান সত্য। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– اِقْرَأْ كِتَابَكَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ الخ (স্বীয় আমল নামা পরে নাও; তোমাদের জন্য আজ এ হিসাবই যথেষ্ট।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ

দ্বাদশ বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সত্যায়ন করছি যে, আল্লাহ তায়ালা সব প্রাণীর মৃত্যুর পর পূনর্জীবন প্রদান করবেন এবং তাদের ঐদিন উঠাবেন যার দৈর্ঘ্য–পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। যেমন প্রতিদান, শাস্তি, পূণ্য এবং হক আদায় হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (নিশ্চয়ই যারা কবরে রয়েছে আল্লাহ তাদের উঠাবেন) আর জান্নাতবাসীদের জন্য মৃত্যুহীন নেশাহীন, সাদৃশ্য ও দিকহীন আল্লাহ তায়ালার দর্শন হবে। আর সৈয়দে আলম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম –এর শাফায়াত প্রত্যেক জান্নাতবাসীর (যদিও মহাপাপকারী হয়) জন্য হক। আর সৈয়দা আয়েশা সিদ্দীকা রাদি আল্লাহু আনহু এবং হযরত সৈয়দা খদীযাতুল কুবরা রাদিআল্লাহু আনহা সমগ্র জাহানের রমনীকুল শ্রেষ্ঠ। তাঁরা সকল মুমিনদের মা (উম্মুল মোমেনীন) এবং পবিত্র, পাক ও পরিস্কার। জান্নাতবাসী জান্নাতে, দোযখবাসী দোযখে সর্বদা চিরস্থায়ী বসবাস করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সম্পর্কে বলেন – أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (এরা জান্নাতবাসী এতে তারা চিরদিন থাকবে)। আর কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (এরা জাহান্নামী, এতে তারা সর্বদা বসবাস করবে।